বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুঁইমাচা’

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুঁইমাচা’ বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত করুণ, মর্মান্তিক এবং বাস্তবধর্মী ছোটগল্প। গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, সামাজিক নিষ্ঠুরতা এবং তার মধ্যে ফুটে ওঠা সাধারণ মানুষের সহজ-সরল অনুভূতির এক নিখুঁত ছবি এই গল্পে আঁকা হয়েছে।

'পুঁইমাচা' গল্পের কাহিনি অংশ নগণ্য। কাহিনির নিজস্ব কোনো অভাবিত চমক নেই, নেই কোনো আকর্ষণীয় অভিনবত্ব। অতি সাধারণ সহজ সরল গল্প। ঘটনাও যা ঘটেছে, সবই গ্রাম্য পরিবেশে ছোটখাটো পারিবারিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই। গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তি সহজ, সরল এবং ভোজনপ্রিয়। তার ভোজনপ্রিয়তা আধুনিক কোনো রুচির অনুবর্তী নয়, গ্রামেরই পরিবেশে সাধারণ সহজলভ্য কোনো প্রকৃতি-খাদ্যকে লক্ষ্যে রেখেই নিয়ন্ত্রিত। সামান্য এই লোভ ও বাসনাটুকু নিয়েই অতি-দারিদ্রের সংসারে মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। বিরোধ এক তরফের, অর্থাৎ মা তার এই স্বভাবের বিরোধী। অন্নপূর্ণা মেয়েকে শাসন করে এমন লোভের জন্য, শাসন করে মেয়ে বড় হয়েও গ্রামের পথে বনে-বাদাড়ে বাবার সঙ্গে ঘুরে কখনও বা একা, কখনো ছোট দুই মেয়ের সঙ্গে ঘুরে খাদ্যের উপযোগী শাক-পাতা সংগ্রহ করার জন্য। মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়ের কথাও মাকে তাড়িত করে। এ সব নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার ঝগড়া হয়। অতি দারিদ্রের সংসারে এসব নিয়েই খুঁটিনাটি বিষয়-নির্ভর ঘটনা ঘটে। কোনো বড় মাপের ঘটনা এ কাহিনিতে নেই, অবান্তরও। বড় ঘটনা বলতে একমাত্র ক্ষেন্তির মৃত্যু। তা-ও লেখক এমনভাবে ঘটিয়েছেন যা সেকালের সেই গ্রাম্য সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যেন বা সর্বজনগ্রাহ্য।

ক্ষেপ্তির মৃত্যু কাহিনিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। অনেক বয়স বেশি এক পুরুষের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ে হয় একদিন। স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার পর পণের টাকা ঠিকমতো না দেওয়ায় তার শাশুড়ির অপবাদ দেওয়া এবং ক্ষেন্তির ভোজনপ্রিয়তার 'অশালীন' রূপের জন্যে ক্ষেন্তির সঙ্গে পিত্রালয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শ্বশুরালয়ের দুর্ব্যবহারে, অবজ্ঞায়, অবহেলায় ক্ষেন্তির একদিন বসন্তরোগে মৃত্যু ঘটে।

কাহিনির শেষে এক সন্ধ্যেয় পিঠে-পুলি তৈরির পরিবেশে অন্নপূর্ণার স্মৃতিতে ধরা, ক্ষেন্তির দুই ছোট বোন রাধী-পুঁটির কথোপকথনে ক্ষেন্তির স্মৃতি বড় হয়ে আসে। সেই স্মৃতির ব্যঞ্জনা ক্ষেন্তির রোপণ করা পুঁইগাছের বৃদ্ধি ও পুঁইমাচায় তার অবস্থানের প্রতীক হয়ে গল্পের সমাপ্তি আনে।

কাহিনির শেষ ক্ষেন্তির মৃত্যুতে। কারণ ক্ষেন্তিই এই গল্পের নায়িকা। কিন্তু গল্পের শেষ লেখকের সেই সূত্রে ব্যবহৃত প্রতীকের ব্যঞ্জনায়। তাই কাহিনি বড় নয়, বড় হয়েছে লেখকের মানব ও প্রকৃতি-সম্পর্কিত রহস্য-গভীর ভাবনার কেন্দ্রই। 'পুঁইমাচা' গল্পের কাহিনির বস্তুভিত্তি থাকলেও তা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তার ঘটনাও লেখকের বাস্তবতার বিশেষ জ্ঞানে ধরা। কাহিনি এখানে কাঠামো মাত্র, গল্পের এক জটিল উদ্দেশ্যকে বহন করার উপযোগী আধার মাত্র। আবার অন্য অর্থে এই কাহিনির অঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পের মূল লক্ষ্যও। তাই কাহিনি সহজ সরল কাঠামো হতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে সূত্রবদ্ধ বলেই কাহিনি-বৃত্ত যথোচিত শিল্পমর্যাদা-সম্পন্ন। গল্পের প্রথম দিকে যে পুঁইচারাটি অসময়ে মাটিতে পুঁতে রেখে ক্ষেন্তি তার অন্তর-রহস্যের প্রকাশ ঘটায়, গল্পের শেষে সেই পুঁইচারাই ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপেক্ষা করে প্রকৃতি প্রদত্ত আপন জীবন-বেগে বড় হয়ে ওঠে, গল্পের ব্যঞ্জনায় গভীরতর সত্যটি স্পষ্ট করে। কাহিনি-বৃত্তের এই সামান্য অংশটুকু ছোটগল্পের প্লটের অপরূপত্ব পেয়েছে। কাহিনি ও ঘটনাকে একেবারে সহজ, সরল সাদামাঠা রেখে গল্প বা উপন্যাসের আধারের শিল্পমর্যাদাকে বড় গৌরব দানের ক্ষমতা সেকালে একমাত্র বিভূতিভূষণের লেখনীতেই অসামান্য মূল্য পেয়েছে-এ ব্যাপারে অন্য গল্পকার থেকে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য স্থায়ী।

পরিশেষে বলা যায়, ‘পুঁইমাচা’ একটি নিছক করুণ রসাত্মক গল্প নয়; এটি গ্রামীণ জীবনের এক করুণ মহাকাব্য। বিভূতিভূষণ অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে অর্থনৈতিক অসাম্য ও সামাজিক কুসংস্কার মানুষের সহজ-সরল আনন্দ ও জীবনকে পিষে মারে। খেঁতির মৃত্যু এবং সবুজ পুঁইমাচার বেঁচে থাকা পাঠককে এক দীর্ঘশ্বাস ও চিরন্তন মানবিক বেদনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।